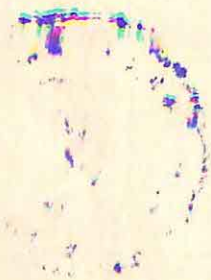


তেল নুন কড়ি

শ্রীশ্যামাপ্রসাদ আচার্য







তেল-নুন-কড়ি

শ্রীশ্যামাপ্রসাদ আচার্য

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার
কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর, ১৯৫৭

মূল্য ঃ পঁচিশ নয়া পয়সা

পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের শিক্ষা-অধিকারের পক্ষে, প্রচার-অধিকর্তা শ্রীপ্রকাশস্বরূপ মাথুর কর্তৃক প্রকাশিত এবং পশ্চিমবঙ্গের সরকারী মুদ্রণে অধীক্ষক শ্রীশুভেন্দু মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত

ভূমিকা

শিশু এবং সদ্যসাক্ষর পাঠকের উপযোগী সাহিত্য রচনা সমাজ-শিক্ষা পরিকল্পনার একটি বিশেষ অঙ্গ। ঐরূপ সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্যে গত দুই বৎসর যাবৎ পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক সাহিত্য-কর্মশালা আয়োজিত ও পরিচালিত হইতেছে। কোন বিশেষ সাহিত্য-ব্রতীর তত্ত্বাবধানে কয়েকজন নির্বাচিত লেখক লইয়া সাহিত্য কর্মশালা সংগঠিত হয়। নতুন আঙ্গিকে এবং বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে লেখকগণ নানা বিষয়ে সাহিত্য রচনায় ব্যাপৃত থাকেন। দেড়মাস কাল তাঁহারা পরস্পরের সান্নিধ্যে থাকিয়া রচনার বিষয়বস্তু, রচনার ভাষা এবং রচনাশৈলী ইত্যাদি বিষয়ে আলাপ আলোচনা করেন। পুনঃপুনঃ আলোচনা, সংশোধন ও পরিবর্তনের ফলে রচনাগুলি যতদূর সম্ভব নির্ভুল, সহজ ও সুখপাঠ্য হইয়া উঠে।

১৯৫৬-৫৭ সনে বাণীপুরে দ্বিতীয় সাহিত্য-কর্মশালার অধিবেশন হইয়াছিল। ইহার পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব ন্যস্ত হইয়াছিল শিশুভারতী-সম্পাদক প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের উপর। ষোলজন লেখক এই কর্ম-শালায় যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সমবেত প্রচেষ্টায় মোট ষোলখানা শিশু ও কিশোর-পাঠ্য বই রচিত হইয়াছে। এই বইখানি উহাদের অন্যতম। শিশু ও কিশোর পাঠক-পাঠিকার পক্ষে সুবোধ্য, সহজ ও সরল ভাষায় বইগুলি লিখিত হইয়াছে। আশা করা যায় যে, বাঙলার শিশু ও কিশোর সম্প্রদায় এই বইগুলি পাঠ করিয়া আনন্দ ও জ্ঞান লাভ করিবে।

সাহিত্য-কর্মশালার পরিচালক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও তাঁহার সুযোগ্য সহকর্মিগণ যে নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার সহিত এই গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পন্ন করিয়াছেন সেজন্য তাঁহারা ধন্যবাদার্হ।

নিখিলরঞ্জন রায়,
সমাজশিক্ষার প্রধান পরিদর্শক,
শিক্ষা-অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ

তেল-নুন-কড়ি

(ক)

শীতের সকাল।

সূর্য-ঠাকুর তাঁর সাত-ঘোড়ার রথে চ'ড়ে যাত্রা শুরু করেছেন।

টুলটুল এখনও বিছানায় শুয়ে। বাইরে বারান্দায় বাবা আর মা পয়সাকড়ি নিয়ে কি যেন বলছেন। টুলটুল ভাবল আজ সকালে বাবার কাছ থেকে একটা পয়সা চেয়ে নিলে কেমন হয়! সরকার মশায়ের দোকানে সুন্দর বাঁশি এসেছে। এইতো সেদিন তার বন্ধু লালু একটা কিনেছিল। মাত্র এক পয়সা দাম।

টুলটুল ভেবেই পায় না, বাঁশি কিনতে আবার পয়সা লাগবে কেন। লজেন্স, বিস্কুট, লাট্টু এমন কি তেল-নুন-চা'ল-ডা'ল কিনতে পয়সার কি দরকার?

যে লোকটি রোজ সকালে তাদের বাড়িতে দুধ দেয় সে পয়সা নেয় মায়ের কাছ থেকে। সুদাম ধোবী কাপড় কাচে তারও পয়সা চাই। ও পাড়ার কুমোরেরা গাড়ি ভর্তি ক'রে হাঁড়ি-কলসী হাটে নিয়ে যায়, পয়সা পায় তার বদলে। এই তো সেদিন এক ছুতোর মিস্ত্রি তাদের ভাঙ্গা জানালাটা সারিয়ে দিয়ে গেল, সেও পয়সা চাইল বাবার কাছে। এমন কি তাদের চাকর ছিরুটা অবধি বাড়ি যাবার সময় পয়সা চায়। সবাই এরা পয়সা চায় কেন? টুলটুল ভেবেই পায় না। আর ভেবে পায় না তার বাবার পকেটে এত পয়সা কোথা থেকে আসে। ভাবল, বাবার কাছে একদিন জিজ্ঞেস করতে হবে এসব কথা।

টুলটুল দেখল বাবা জামা-কাপড় প'রে বাইরে চলেছেন। এক লাফে উঠে পড়ল সে। নেমেই বাবার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

''বাবা''—টুলটুল ডাকল।

বাবা বললেন—''কি রে টুলটুল।''

টুলটুল—''আমাকে একটা পয়সা দাও না।''

বাবা—''কেন, এই সকালে পয়সা দিয়ে কি হবে শুনি?''

টুলটুল—''সরকার মশায়ের দোকানে ভারি চমৎকার বাঁশি এসেছে। আমি একটা চাইলাম, সরকার মশায় বললেন, 'পয়সা নিয়ে এস'। আচ্ছা বাবা, বাঁশি কিনতে পয়সা লাগবে কেন?''

টুলটুলের দাদা দীপু পাশে দাঁড়িয়েছিল, বলল, ''কি বোকা! পয়সা না হ'লে বাঁশি দেবে কেন? ওরা যে বিক্রি করে।''

বাবা টুলটুলকে একটি পয়সা দিলেন। আর বললেন, ''বাঁশির বদলে সরকার মশায় কেন পয়সা চেয়েছেন, সে এক মজার গল্প। বাড়ি ফিরে এসে তোমাদের বুঝিয়ে দেবো। ঘুমিয়ে প'ড় না যেন ততক্ষণে।''

পয়সাটা হাতের মধ্যে চেপে ধরে মাথা নাড়ল টুলটুল। তারপর বাইরে এসে দাঁড়াল। বাবা চলে গেলেন কাজে।

(খ)

বিকাল।

সূর্যদেব তখন পাটে বসেছেন।

পশ্চিমের আকাশটায় কে যেন সিঁদুর ছড়িয়ে দিয়েছে।

বাঁশি পেয়ে সকালের সব কথা ভুলে গেছে টুলটুল।

ঘরে আলো জ্বালিয়ে দিলেন মা। টুলটুল ঘরে এল। বাবা বসেছেন একটা আলোর সামনে। সেদিনকার খবরের কাগজটার উপর চোখ বুলিয়ে চলেছেন। দীপু বাবার পাশে বসেছিল। বলল, "বাবা, সকালের গল্পটা তো বললে না?"

বাবা—"হ্যাঁ, এখনই বলব। সকালের পয়সাটা কি করলে টুলটুল?"

টুলটুল—"কেন, সরকার মশায়ের দোকান থেকে বাঁশি কিনেছি যে। দেখ না কেমন চমৎকার আমার বাঁশিটা!"

বাবা—"বাঁশি তো সরকার মশায়ের দোকানের, ওটা তোমার হ'ল কি ক'রে?"

টুলটুল—"বা রে, আমি যে তাকে একটা পয়সা দিয়েছি।"

বাবা—"কেন দিয়েছ টুলটুল?"

টুলটুল—"সে যে চাইল আমার কাছে। পয়সা না হ'লে বাঁশি দেবে না সে তো ব'লেই দিয়েছে।"

বাবা—"কিন্তু কেন বলতে পারো?"

দীপু—"সেটাই তো তুমি বলবে বলেছিলে, বাবা।"

বাবা—"আচ্ছা শোন। বেঁচে থাকবার জন্য আমাদের অনেক জিনিসের দরকার। প্রথম দরকার 'খাওয়া'। না খেয়ে আমরা বাঁচতে পারি না। চা'ল, ডা'ল, তেল, নুন, আলু, কপি, টম্যাটো, মাছ, মাংস, শাক এ রকম অনেক জিনিস আমরা খাই।

এর পরেই দরকার কাপড়, জামা, জুতো এইগুলি। তারপর দরকার 'আশ্রয়'। 'আশ্রয়' বলতে কি বোঝায় বল তো টুলটুল?"

টুলটুল—"থাকবার জায়গা।"

বাবা—"হ্যাঁ, বেঁচে থাকতে হ'লে থাকবার জায়গারও প্রয়োজন। এই সমস্ত জিনিস ছাড়া আরো অনেক কিছু আমাদের দরকার। যেমন ধর টুলটুলের বাঁশি।"

দীপু—"বেঁচে থাকবার জন্য বাঁশিটার কি দরকার, বাবা?"

বাবা—"ওটা যে না হ'লেই চলবে না, এমন নয়। তবু ওটা না হ'লে টুলটুলের মন খারাপ হয়ে যাবে। পড়াশুনায় ওর আর উৎসাহ আসবে না। আসলে চা'ল, ডা'ল, তেল, নুন থেকে আরম্ভ ক'রে বিস্কুট, লাট্টু সব জিনিসেরই একটা না একটা প্রয়োজন আছে। আর দিন দিন আমাদের প্রয়োজন বেড়েই চলেছে। কিন্তু আমাদের যত জিনিসের প্রয়োজন তার সবগুলো একজন লোকের পক্ষে তৈরি করা সম্ভব নয়। কি বল, তোমরা যদি বাঁশিটা তৈরি করতে পারতে তা হ'লে কি আর সরকার মশায়ের দোকানে কিনতে যেতে?"

টুলটুল—"না বাবা, বাঁশি তৈরি করতে পারলে কি মজাই না হ'ত!"

বাবা—"মজা হ'ত ঠিকই কিন্তু মুশকিল আছে। কারণ কি জান? একজনে যদি সবগুলো জিনিস তৈরি করতে যায় তা হ'লে কোন জিনিসই ভাল হবে না। সেজন্য কুমোর শুধু হাঁড়িই গড়ে। তাঁতী শুধু কাপড় বোনে। ছুতোর কাঠের কাজ করে। কৃষকেরা ধান, পাট, তরি-তরকারি জন্মায়। এইভাবে এক-একজনে এক-একটি কাজ বেছে নিয়েছে। তাই তো তারা নিজের নিজের কাজটি এমন সুন্দরভাবে করতে পারে।

কিন্তু এই যে এক-একজনে এক-একটি জিনিস তৈরি করে এদের প্রত্যেকেরই অনেক জিনিসের দরকার। যেসব জিনিস নিজেরা তৈরি করে না তাও তাদের প্রয়োজন। যেমন ধর কুমোর। সে শুধু হাঁড়ি-কলসী গড়ে। কিন্তু বেঁচে থাকতে হ'লে তারও চাই, চা'ল, ডা'ল, তেল, নুন, কাপড়, জামা। এসব জিনিস সে কোথায় পাবে?"

দীপু—"কেন বাবা, অন্যদের কাছ থেকে চেয়ে নেবে!"

বাবা—" তা হয় না দীপু। অন্যেরা তাকে দেবে কেন? তা ছাড়া শুধু ভিক্ষা চেয়ে বেঁচে থাকা সে তো অপমান। তাই কুমোর কি করবে জান?"

টুলটুল—"কি করবে বাবা?"

বাবা—"সে তার হাঁড়ি-কলসীর বদলে কৃষকের কাছ থেকে চা'ল, ডা'ল, তরি-তরকারি নিয়ে আসবে। কৃষকের হাঁড়ি-কলসীর দরকার, আর কুমোরের চা'ল, ডা'ল দরকার। তাই তারা একের জিনিসের সঙ্গে অপরের জিনিস বদল করবে।"

দীপু বলল—"কই, সে রকম তো হয় না বাবা। সকলেই তো পয়সা নিয়ে জিনিস বিক্রি করে।"

বাবা—"ঠিক বলেছ দীপু। এখন মানুষ টাকা পয়সা আবিষ্কার করেছে তাই আর জিনিসের বদলে জিনিস দেওয়া-নেওয়া করে না। কিন্তু একদিন ছিল, যখন টাকা-পয়সার কথা লোকে জানতই না। তখন এ রকম বদল ক'রেই লোক জীবনধারণ করত। কিন্তু জিনিসে জিনিসে বদল করার মুশকিল ছিল অনেক। ধর এক কুমোরের চা'লের দরকার। সে তার হাঁড়ি-কলসী নিয়ে এক কৃষকের বাড়িতে গেল। কিন্তু কৃষকের হাঁড়ি-কলসীর দরকার নেই। তখন?"

টুলটুল—"সে তখন অন্য কৃষকের বাড়িতে যাবে।"

বাবা—"তা হ'লে কুমোরকে হাঁড়ি-কলসী মাথায় নিয়ে ঘুরে ঘুরে খোঁজ নিতে হবে, কোন্ কৃষকের দরকার আছে। এই অসুবিধার জন্য মানুষেরা ঠিক করল সব জিনিসেরই এক-একটা দাম বেঁধে দিতে হবে। আর সে দাম ঠিক হবে গরু বা ঐরকম কোন জীবজন্তু দিয়ে। যেমন ধরো, ৫০টি হাঁড়ির দাম একটি গরু। দশ জোড়া কাপড়, ১ মণ তেল, ৩ মণ চা'ল, প্রত্যেকটি জিনিসের মূল্য এক-একটি গরু। তা হ'লে দেখতে পাচ্ছ কুমোরকে আর বেশি দূর হাঁটাহাঁটি করতে হবে না। সে তার হাঁড়ি-কলসী তাঁতী, কলু, কামার যার কাছেই হোক বিক্রি ক'রে পাবে গরু। আর সেই গরু দিয়ে কৃষকের কাছ থেকে কিনে আনবে চা'ল, ডা'ল, তরি-তরকারি।"

দীপু—"আমরা তো এখন গরু দিয়ে জিনিসপত্র কিনি না বাবা।"

বাবা—''এখন কিনি না। কিন্তু পৃথিবীর বহু দেশে আগেকার মানুষ জীবজন্তু দিয়ে কেনাবেচা করত। প্রাচীন গ্রীস দেশে ষাঁড় দিয়ে জিনিস কেনাবেচা চলত। আইসল্যান্ডের অধিবাসীরা কেনাবেচা করত 'মাছ' দিয়ে। কিন্তু এর কতকগুলি অসুবিধা ছিল। কারণ ষাঁড়, মাছ, বা ঐরূপ কোন জীবজন্তুকে দূর দূর দেশে নিয়ে যাওয়া যায় না। তা ছাড়া, ধরো একজন কুমোর বছরে যত হাঁড়ি-কলসী তৈরি করে তা বিক্রি ক'রে সে ১৫টি গরু পায়। কিন্তু বছরে তার যে সমস্ত জিনিসের দরকার সেসব কিনতে তার মাত্র ১০টি গরুর প্রয়োজন, তা হ'লে ৫টি গরু তার জমা থাকে। কিন্তু ঐভাবে জমিয়ে রাখার মুশকিল ছিল। কারণ, জীবজন্তু যে কোন সময় মারা যেতে পারে। যদি ঐ কুমোরের ৩টি গরু মারা যায় তা হ'লে তার ভয়ানক ক্ষতি হ'বে। এজন্য এমন কোন জিনিসকে টাকা ব'লে ধরতে হ'ল যা' সহজে দূরে দূরে নিয়ে যাওয়া যায় বা সহজে নষ্ট হয় না এবং ভবিষ্যতের জন্য জমিয়ে রাখা চলে।

আমাদের দেশে এক সময় 'কড়ি' দিয়ে কেনাবেচা হ'ত। রুশদেশে মধ্যযুগে কেনাবেচা চলত 'চামড়া' দিয়ে।''

দীপু বলল—''সত্যিই এ রকম ছিল নাকি, বাবা?''

বাবা—''হ্যাঁ দীপু। কিন্তু মানুষ যতই সভ্য হ'তে লাগল ততই 'কড়ি' বা ঐরকম টাকার ব্যবহার উঠে গেল। কারণ টাকা এমনই জিনিস যা তৈরি করার ভার সকলের হাতে ছেড়ে দেওয়া চলে না। তাই টাকা তৈরির ভার রাজারা হাতে নিলেন। এবার আর জীবজন্তু নয়, দামী দামী ধাতু দিয়ে রাজার টাঁকশালে তৈরি হ'তে লাগল টাকা।

আমাদের দেশে প্রথম যুগে তামা দিয়ে টাকা তৈরি হ'ত। প্রাচীন তক্ষশীলা, মগধ প্রভৃতি রাজ্যে তামা এবং রুপো এই দুই ধাতুই ব্যবহার করা হ'ত টাকা তৈরির জন্য। সোনার টাকার প্রথম প্রচলন হয় কুষাণ যুগে। ব্যবসা-বাণিজ্যে তখন সোনা এবং তামা দুই ধাতুর টাকারই ব্যবহার ছিল।

রাজাদের এইসব টাকার উপর আঁকা থাকত রাজার নামের মোহর। এ ছাড়া টাকার উপর নানা ছবিও আঁকা হ'ত। প্রাচীন ভারতের বহু জন্তু-জানোয়ারের ছবি-আঁকা টাকা পাওয়া গেছে। এদের অনেকগুলির উপর হাতী, ষাঁড়, গণ্ডার প্রভৃতির ছবি দেখা গেছে। এ ছাড়া দেবদেবীর মূর্তিও আঁকা আছে অনেক টাকার উপর।''

দীপু বলল—''ভারি মজার গল্প তো! আচ্ছা বাবা, এখন কাগজ দিয়ে টাকা তৈরি হয়, তাই না? এটা কেমন ক'রে হ'ল?''

বাবা—''এখনকার টাকা কাগজ দিয়েই তৈরি হয়। কারণ, এতদিনে আমরা বুঝতে পেরেছি যে, টাকা জিনিস বদল করার একটা ফিকির মাত্র। কাজেই তাকে এমন কিছু দিয়ে তৈরি করা হয় যা খুব সহজে দূরে দূরে নিয়ে যাওয়া যায় এবং বেশি একসঙ্গে রাখা যায়। কাগজের টাকা একটা অঙ্গীকারপত্র। এর উপরে দেশের সরকার লিখে দেন যে, এই টাকার বদলে নির্দিষ্ট মূল্যের জিনিস দিতে প্রত্যেক উৎপন্ন দ্রব্যের মালিক বাধ্য থাকবেন। আর কাগজের নোটের বদলে জিনিসপত্রের আসল যা মূল্য সেইমত মূল্যবান ধাতু (সোনা প্রভৃতি) সরকারী কোষে জমা রাখা হয়।

এক টাকায় যতগুলি জিনিস কিনতে পারা যায় সেটাই টাকার মুদ্রামূল্য। এই মুদ্রামূল্য সব সময় এক রকম থাকে না। অর্থাৎ কখনও বা একটি টাকা দিয়ে বেশি জিনিস কেনা যায়, কখনও বা কম জিনিস কেনা যায়। যেমন ধর, বাঙ্গলা দেশে এক সময়ে সায়েস্তা খাঁ নামে মুঘল সম্রাটদের এক প্রতিনিধি শাসন করতেন। তাঁর সময়ে এক টাকায় ৮ মণ চা'ল পাওয়া যেত। কিন্তু এখন এক টাকায় বড় জোর ২ সের চা'ল পাওয়া যেতে পারে। মুদ্রামূল্যের এই ওঠা-নামার অনেক কারণ আছে। সেগুলি তোমরা বড় হয়ে জানতে পারবে।''

দীপু—''এখন টাকা পয়সা কোথায় তৈরি হয়, বাবা?''

বাবা—"দেশের সরকার টাকা তৈরি করার জন্য 'টাঁকশাল' খুলেছেন। সেই টাঁকশালে সব টাকা পয়সা তৈরি হয়। বাইরের কোন লোকের টাকা তৈরি করার অধিকার নেই। করলে শাস্তি পাবে। সরকারী টাঁকশালের টাকা দিয়ে জিনিস বদল হবে।

প্রত্যেক মানুষই তার তৈরি জিনিসের বদলে পাবে টাকা। আর সেই টাকা দিয়ে সে তার প্রয়োজনমত জিনিস কিনবে। কোন লোকের পরিশ্রমটাকেও জিনিস ব'লে ধরা হবে। যেমন ধর, আমি আপিসে চাকরি করি। সেখানে আমি তাদের শ্রম দিচ্ছি, আর আমার খাটুনির বদলে তারা আমাকে টাকা দেয়। সে টাকা দিয়ে আমরা আমাদের প্রয়োজনমত জিনিসপত্র কিনি। সেই টাকা দিয়েই কেনা হয় চা'ল, ডা'ল, তেল, নুন ইত্যাদি বেঁচে থাকবার সমস্ত উপকরণ। সেই টাকা দিয়েই আজ টুলটুল কিনেছে এক পয়সা দামের বাঁশি।"

টুলটুল—"টাকার গল্প তো ভারি মজার!"

বাবা—"হ্যাঁ টুলটুল। টাকার কিন্তু সবদেশে এক রকম নাম নয়। ইংল্যান্ডে এর নাম 'পাউন্ড-স্টারলিং', আমেরিকায় এর নাম 'ডলার', জাপানে 'ইয়েন', ফ্রান্সে 'ফ্রাঙ্ক'। এই রকম নানা নাম আছে টাকার।

আরেকটা কথা ব'লে আজকের গল্প শেষ করব। ছোট ছোট কেনাবেচাগুলির সুবিধার জন্য টাকাকে ছোট ছোট কতকগুলি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। আমাদের দেশের টাকাকে ৬৪ ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। এইভাবে ভাগ করার নিয়মটা কি ক'রে যে গ'ড়ে উঠল তা বলা শক্ত। তবে এভাবে ছাড়াও অন্যভাবেও টাকাকে ভাগ করা চলত, এবং তাতে বরং হিসাবের সুবিধাই হ'ত।

যেমন ধর, ভাগ করবার সময় ১, ২, ৩, ৪ প্রভৃতি সংখ্যাগুলির মধ্যে ১০ বা যে সংখ্যার শেষে শূন্য আছে সেইরূপ সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা সব থেকে সুবিধাজনক। তুমি

যদি কোন সংখ্যাকে ১০ দিয়ে ভাগ করতে চাও, আর সে সংখ্যার শেষে যদি শূন্য থাকে তা হ'লে সব থেকে সোজা নিয়ম হ'ল ভাজ্যের শেষের দিকের একটা শূন্য কেটে দেওয়া। গুণ এবং ভাগের খুব সুবিধা হয়েছে শূন্যের এই আবিষ্কারে। আর শূন্য আবিষ্কৃত হয়েছে আমাদের ভারতবর্ষে। এজন্য বর্তমান যুগের অঙ্কশাস্ত্র ভারতবর্ষের কাছে বিশেষভাবে ঋণী।

এবার তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে আমাদের দেশের টাকাকে যদি ১০ বা ১০০ ভাগে ভাগ করা হ'ত তা হ'লে হিসাবের ভারি সুবিধা হ'ত। কিন্তু তবুও ৬৪ ভাগে টাকাকে ভাগ করায় যে সমস্ত অসুবিধা হয়েছিল, হিসাব করার একটা নতুন প্রণালী আবিষ্কার ক'রে সেগুলি অনেকাংশে দূর করেছিলেন একজন বাঙ্গালী। এঁর নাম শুভঙ্কর।


এক নয়া পয়সা


দুই নয়া পয়সা


পাঁচ নয়া পয়সা


দশ নয়া পয়সা


পাঁচিশ নয়া পয়সা


পঞ্চাশ নয়া পয়সা


একশত নয়া পয়সা

পৃথিবীর সকল দেশেই কিন্তু টাকাকে ৬৪ ভাগে ভাগ করা হয় নি। অনেক দেশে ১০০ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ঐভাবে ভাগ করলে হিসাবের যে সুবিধা হয় সে সমস্ত কথা বিবেচনা ক'রে আমাদের দেশের টাকাকেও এখন থেকে ১০০ ভাগ করা হবে। অর্থাৎ এখন থেকে ১০০ পয়সায় হবে এক টাকা। কিন্তু একদিনেই তো আর এ রকম পরিবর্তন করা যায় না। তাই কিছুদিনের জন্য ৬৪ ভাগের পয়সা আর ১০০ ভাগের পয়সা দুই রকমই বাজারে চলবে। ৬৪ ভাগের পয়সাগুলিকে শুধু পয়সাই বলা হবে। কিন্তু ১০০ ভাগের পয়সাগুলিকে বলা হবে 'নয়া পয়সা'। এই ব্যবস্থাটা অল্প কয়েক বছরের জন্য মাত্র। এর পর ৬৪ ভাগের পয়সা আর থাকবে না। আগেকার সব মুদ্রাগুলি (পয়সা, আনি, দু'আনি ইত্যাদি) সরকার নিয়ে নেবেন। তখন পয়সা বলতে বোঝাবে এখনকার 'নয়া পয়সা', অর্থাৎ এক টাকার ১০০ ভাগের এক ভাগ। বুঝলে টুলটুল?"

ততক্ষণে টুলটুলের চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছে। বাবা বললেন—"আজ এই পর্যন্ত থাক। টাকা-কড়ির গল্প আর একদিন বলব।"

পশ্চিমমু-৫৭/৮-৫০৯৩এক-৫,২৫০



सत्यमेव जयते